শ্রমিকের কাছে
সর্বহারা রুচি সংস্কৃতি তুলে ধরতে হবে

১৯৭৪ সালে, দুর্গাপুর স্টিল-ওয়ার্কার্স কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রথম সম্মেলনে কমরেড শিবদাস ঘোষ এই ভাষণ দেন। বর্তমান মুহূর্তে মেকি মার্কসবাদীদের অর্থনীতিবাদ সর্বস্ব আন্দোলন যখন গণমুক্তির জন্য অপরিহার্য বিপ্লবী সংগ্রামের পথ থেকে শ্রমিকদের পিছনে টানছে, সেই সময়ে এই ভাষণ তার বিরুদ্ধে এক অমূল্য দলিল। কমরেড শিবদাস ঘোষ এ দেশের পুঁজিবাদী শাসন-শোষণের অবসানকল্পে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পূর্ণ করার প্রয়োজনীয় মূল রাজনৈতিক লাইনের রূপরেখাটি তুলে ধরতে গিয়ে কীভাবে শ্রমিক আন্দোলনগুলিকে পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে গড়ে তুলতে হবে, তারও ব্যাখ্যা তুলে ধরেন। একই সঙ্গে আধুনিক সংশোধনবাদ-সংস্কারবাদ এবং বুর্জোয়া-পেটিবুর্জোয়া পঙ্কিলতা, বিচ্যুতি ও নীতিভ্রষ্টতার হাত থেকে শ্রমিক জনতাকে মুক্ত করতে শ্রমিক আন্দোলনগুলি যাতে উন্নত রুচি-সংস্কৃতি-নীতি-নৈতিকতা অর্জনের সংগ্রামের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে, তার উপরও বিশেষ জোর দেন।

কমরেড সভাপতি ও উপস্থিত বন্ধুগণ,

দুর্গাপুর স্টিল ওয়ার্কারদের এই সমাবেশে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং বর্তমান অবস্থায় শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের করণীয় কী এই নিয়ে আলোচনা করার জন্য আমাকে অনুরোধ করা হয়েছে। দুর্গাপুর স্টিল ওয়ার্কার্স কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রথম বার্ষিক সম্মেলনের এই প্রকাশ্য অধিবেশনে আমাকে যে কিছু বলতে বলা হয়েছে এর জন্য আমি আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রথমেই যে কথাটা আমি আপনাদের বলতে চাই তা হ'ল এই যে, সকলেই একটা কথা অনুভব করছেন, প্রত্যেকেই একটা কথা ভাবছেন, যার যেমন উপলব্ধি হোক না কেন ভাবছেন যে, চারদিকে দেশের অবস্থার এমন অবনতি ঘটছে কেন? যে কথাটা কমরেড ব্যানার্জী[১] বলে গেলেন যে শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বিশেষ করে জাতির নৈতিক দিকটার প্রতি যদি লক্ষ্য করা যায়, তাহলে দেখা যাবে পরিস্থিতি সত্যিই আঁতকে ওঠার অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে।

একটা কথা আমি আপনাদের না বলে পারছি না যে, না খেয়ে থেকেও, শোষণে অত্যাচারে জর্জরিত হয়েও, দিনের পর দিন অর্ধভুক্ত ও অর্ধনগ্ন অবস্থায় থাকার পরেও একটা জাতি উঠে দাঁড়াতে পারে, লড়তে পারে, লড়বার শক্তি অর্জন করতে পারে, সংগঠিত হতে পারে, মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে — যদি সেই জাতির নৈতিক বল অটুট থাকে এবং জনসাধারণের সামনে একটি সঠিক আদর্শ খাড়া থাকে। ভিয়েতনামের দিকে চেয়ে দেখুন, চীন বিপ্লবের ইতিহাস পড়ুন, প্রাক্-বিপ্লব চীনের মানুষের আর্থিক দুর্গতি, অত্যাচার, শোষণ কী চরম অবস্থায় পৌঁছেছিল স্মরণ করুন। কিন্তু তবু সেই সমস্ত দেশের মানুষ এবং জনশক্তি উঠে দাঁড়াতে পেরেছে। পেরেছে একটা জিনিসকে কেন্দ্র করে। সেটা হচ্ছে — এত অত্যাচার, লাঞ্ছনার মধ্যেও জনগণের চরিত্রে, জাতির চরিত্রে খানিকটা নৈতিক বল পুরনো নীতি-নৈতিকতাকে কেন্দ্র করে হলেও সমাজ-অভ্যন্তরে বজায় ছিল এবং এটাই জনসাধারণকে সঠিক বিপ্লবী আদর্শ গ্রহণ করতে এবং সেই অনুযায়ী সংগ্রামের উপযোগী নতুন নৈতিক বল অর্জন করতে সক্ষম করে তুলেছিল। তাই ভিয়েতনামের মানুষকে বোমা মেরে ধ্বংস করা গেল না। গোটা দেশকে মরুভূমি বানিয়ে দিয়েও সেই দেশের নিরন্ন বুভুক্ষু অশিক্ষিত চাষী এবং জনসাধারণের মাথাকে নোয়ানো গেল না। বারো-তেরো বছরের কিশোর-কিশোরী থেকে শুরু করে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা পর্যন্ত মরণপণ করে লড়বার এই তেজ পেল কোত্থেকে? তারা কি সকলেই লেনিন-স্ট্যালিন? তারা কি সকলেই বিপ্লবের সমস্ত তত্ত্ব সুন্দরভাবে বুঝে গিয়েছিল নাকি? এতো অবাস্তব কথা। কিন্তু একটা জিনিস তাদের ছিল ও আছে যেটিকে ভিত্তি করে সর্বপ্রকার শোষণের বিরুদ্ধে অমিত তেজে তারা খাড়া হতে পেরেছিল।

ভারতবর্ষের শাসক সম্প্রদায় জাতির সেই নৈতিক চরিত্রটিকে সম্পূর্ণরূপে ভেঙে ফেলার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

তারা অত্যন্ত ধুরন্ধর। তারা জানে যে শত অত্যাচার ও দমনপীড়ন করেও, না খেতে দিয়েও একটা জাতিকে, একটা দেশের জনসাধারণকে শুধু পুলিশ ও মিলিটারির সাহায্যে বেশিদিন পদদলিত করে রাখা যায় না। সমস্ত যুগের 'ডেসপট'-দের (স্বৈরাচারী শাসকদের) অত্যাচারের ইতিহাস একটি কথা বাতলায় যে শোষণ এবং দমন দিয়ে, পুলিশি শাসন ও মিলিটারি শক্তি দিয়ে শেষ পর্যন্ত জনশক্তিকে দমানো যায় না, ক্ষমতা রক্ষা করা যায় না। জনশক্তি মাথা উঁচু করে উঠে দাঁড়ায় যদি তারা সঠিক বিপ্লবী আদর্শের হদিশ পায় এবং তাদের নৈতিক বল অটুট থাকে।

ভারতবর্ষের বুর্জোয়ারা, শাসক সম্প্রদায়েরা ইতিহাস থেকে ভাল শিক্ষাটি নেয়নি। কিন্তু শয়তান শাসক-শোষক হিসাবে তাদের যেটি দরকার ছিল, সেই কার্যকরী শিক্ষাটি কিন্তু ঠিক তারা নিয়েছে। সেটি হচ্ছে জাতির নৈতিক বল খতম করে দাও, জাতির চরিত্রকে মেরে দাও। তাহলে তারা না খেতে পেয়ে, শত অত্যাচারেও কুকুরের মত গুমরাতে থাকবে, ক্ষোভ প্রকাশ করবে, হয়ত কখনও বিচ্ছিন্নভাবে বিদ্রোহও করবে;কিন্তু সংগঠিত বিপ্লবী আন্দোলনের জন্ম দিতে পারবে না — বিপ্লব সংগঠিত করতে পারবে না। কেননা বিপ্লবী আদর্শ গ্রহণ এবং বিপ্লব সংগঠিত করার জন্য সঠিক মূল রাজনৈতিক লাইন এবং সঠিক বিপ্লবী নেতৃত্ব ছাড়াও যেটি অপরিহার্য সেটি হ'ল নৈতিক বল।

বাস্তব রাজনীতির দোহাই দিয়ে সঙ্কীর্ণ দলীয় স্বার্থে মানুষের মধ্যে নীচ প্রবৃত্তিগুলিকে বাড়িয়ে দেওয়ার ঘৃণ্য চক্রান্ত

তাই এই যে সাংস্কৃতিক অবক্ষয় দেখছেন, এটা একটা 'অ্যাক্সিডেন্ট' নয়। 'স্পন্টেনিয়াস' (স্বতঃস্ফূর্ত) 'সামথিং' (কিছু একটা) নয়। এমন একটা ব্যাপার নয়, যেটা পূর্ব নির্ধারিত একটা 'ফ্যাটালিস্টিক' (অবশ্যম্ভাবী) ঘটনা — যেন হওয়ারই কথা ছিল, যেটা হবেই এবং তাই হচ্ছে। গভীরে গিয়ে দেখলে ধরা পড়বে, যদিও এটা ঘটছে লোকচক্ষুর অন্তরালে তবুও এর পিছনে রয়েছে শাসক সম্প্রদায়ের একটা পরিকল্পনা এবং প্রশ্রয়। মানুষকে এরা মুখে বলছে সৎ হও, ভাল হও। অথচ 'প্র্যাক্টিক্যাল পলিটিক্স্'-এর (বাস্তব রাজনীতির) দোহাই দিয়ে ক্ষুদ্র পার্টি স্বার্থে শুধু আশু প্রয়োজনটাকে সামনে রেখে, শাসকদলই শুধু নয়, বিপ্লবের তক্মাধারী অনেক দলই মানুষের মধ্যে যে নীচ প্রবৃত্তিগুলো রয়েছে তাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। কাপুরুষোচিত আক্রমণের প্রবৃত্তিকে, দশজনে মিলে একজনকে মারার হীন কার্যকলাপকে, তত্ত্ব আলোচনা যুক্তিবিচারের বদলে অসহিষ্ণুতা প্রভৃতিকে সংগ্রাম ও লড়াই-এর নামে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। লোভ-লালসা ও নীচতা, যা একটা মানুষকে অমানুষ করে, তার বীরত্ব এবং যথার্থ মর্যাদাবোধকে নষ্ট করে দেয়, তাকেই আজ প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। টাকার বিনিময়ে কর্মীদের দিয়ে পার্টির বা ইউনিয়নের নিয়মিত কাজ করানো হচ্ছে এবং নির্বাচনের কাজ করানো হচ্ছে। এ সবই চলছে আজ বাস্তব রাজনীতির দোহাই দিয়ে। লক্ষ লক্ষ বেকারে আজ সারা দেশ ভরে গেছে, পেট চলছে না মানুষের। সেই সুযোগে এই রাজনৈতিক দলগুলি তাদের ব্যবহার করছে, এইভাবেই তাদের 'এমপ্লয়মেন্ট'(চাকরি) দিচ্ছে ! আপনারা জানেন যে, সব মানুষই দোষে গুণে মিশিয়ে মানুষ। মানুষের মধ্যে যে সমস্ত ভাল দিক রয়েছে অর্থাৎ তার মধ্যে যে সব ভালর দিক — সাহস, বীরত্ব, সহানুভূতি, উদারতা ও কর্তব্যের দিক রয়েছে, সেই দিকগুলোকে বাড়াতে সাহায্য করেই একমাত্র তার দোষকে দূর করা যায়। শুধুমাত্র দোষকে দূর হতে বললেই তা দূর হয়ে যায় না, বা মানুষকে সৎ হও, ভাল হও বললেই মানুষ সৎ ও ভাল হয় না। অথচ একদিকে সৎ হও, ভাল হও বলে এই উপদেশ আর অন্যদিকে বাস্তব রাজনীতির দোহাই পেড়ে যারা বা যে দলই হোক্ না কেন, বুক্নি তাদের যাই হোক্ না কেন — মানুষের মধ্যে নীচ প্রবৃত্তিগুলোকে উস্কানি দিয়ে এবং এর দ্বারা তারা জেনে হোক্, না জেনে হোক্, নিজেরা ব্যক্তিগতভাবে সৎ হোন বা অসৎ হোন সেটা অত বড় প্রশ্ন নয়, এর দ্বারা তারা আসলে গোটা দেশের সাংস্কৃতিক পরিবেশকে, জাতির নৈতিক চরিত্রকে ধ্বংস করার বুর্জোয়াশ্রেণীর যে ষড়যন্ত্র তাকে সফল হতে সাহায্য করছেন।

লুম্পেন ও ভিক্ষুকরা কোন দেশে বিপ্লব করে না — আদর্শ ও রাজনীতি সচেতন সংগঠিত শোষিত জনতাই বিপ্লবের শক্তি

এই যদি অবস্থা হয়, তাহলে তো জাতির নৈতিকতা মরবেই। আর নৈতিকতা বাদ দিয়ে বিপ্লব হয় না। যাঁরা মনে করেন যে, মানুষের আর্থিক দুর্গতি এবং তাদের ওপর জুলুম নিপীড়ন বাড়লেই আপনা-আপনি বিপ্লব

হয়ে যাবে — আমি বলব তাঁরা মূর্খ। তাঁরা জানেন না যে, কোন দেশে কোনদিনই ভিক্ষুকরা বিপ্লব করে না। বিপ্লব করে শোষিত জনসাধারণ। এ কথাটার একটা মানে আছে। 'লুম্পেন'-রা (নষ্ট চরিত্ররা) বিপ্লব করে না। বরং সর্বদেশেই লুম্পেন-রা বুর্জোয়াদের হাতে, ফ্যাসিস্টদের হাতে বিপ্লবের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার বাহিনী হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। তাই মার্কস্ থেকে লেনিন, মাও সে-তুং সকলকেই বলতে হয়েছে যে আর্থিক দুর্গতির জন্য প্রলেতারিয়েতদের মধ্যে যারা লুম্পেন বনে যাচ্ছে, তারা আমাদের কেউ নয়, তারা সর্বহারা বিপ্লবী নয়। বিপ্লবী সর্বহারাকে বিপ্লবের জন্যই এই 'লুম্পেনিজম্'-এর (লুম্পেনির) বিরুদ্ধে লড়তে হয়। তাই অভাব থাকলেই তার থেকে বিপ্লব ফেটে পড়ে না। ফেটে যা পড়ে তা বিক্ষোভ। তার দ্বারা শেষ পর্যন্ত শোষকদেরই লাভ হয় বেশি। রাস্তা ভুল, নেতৃত্ব ভুল, তত্ত্ব ভুল, বিপ্লব সম্বন্ধে স্বচ্ছ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নেই এমন অসংগঠিত জনসাধারণের লড়াই যখন সংগঠিত রাষ্ট্রের দমনের সামনে পর্যুদস্ত হয়, তখন আসে 'ডিফিটিজম' (পরাজয়ের মনোভাব)। মানুষের মধ্যে যে লড়াইয়ের প্রবণতা ছিল তা এইভাবে নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ার ফলে হতাশা ও পরাজয়ের মনোভাব গণআন্দোলনগুলিকে কিছুদিনের জন্য হলেও গ্রাস করে বসে। ফলে শোষক সম্প্রদায়ের হয় সবচেয়ে সুবিধা। এই সুযোগে শোষক সম্প্রদায় তাদের কাজটাকে গুছিয়ে নেয়। তাদের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক সংগঠনকে আরও খানিকটা মজবুত করে তোলে।

একটু চোখ বুজে আমাদের দেশের ইতিহাসটা ভাবতে থাকুন, দেখবেন এ দেশে লড়াই বার বার হয়েছে। এ কথা তো কেউ বলতে পারবে না যে এদেশের যুবকরা, শ্রমিকরা, দেশের মেহনতী জনসাধারণ লড়তে চায়নি, ময়দানে লড়তে নামেনি, জেলে যেতে তারা ভয় পেয়েছে, জান দিতে তারা ভয় পেয়েছে, কোরবানি করতে ভয় পেয়েছে। এ কথা বলার সাহস কারোরই হবে না। যাঁরাই ইতিহাস জানেন, তাঁরাই জানেন যে এদেশে মানুষ বার বার লড়বার জন্য বারুদের মত ফেটে পড়েছে। স্বাধীনতা অর্জিত হবার পরেও গত ২৭ বছরের মধ্যে শুধু এই পশ্চিমবঙ্গেই নয়, গোটা ভারতবর্ষে কত আত্মত্যাগ, কত রক্তপাত না হয়েছে, শ্রমিক চাষী ও নওজোয়ান ছাত্র-যুবকরা কতবার না দিয়েছে আত্মাহুতি। বিপ্লবের জন্য কী প্রবল আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বার বার এ দেশের মানুষ আন্দোলনে এগিয়ে এসেছেন, প্রাণ দিয়েছেন। অথচ তার ফল কী হয়েছে? সকলেই আজ বলছেন প্রতিক্রিয়া শক্তিশালী হয়েছে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর আক্রমণ হচ্ছে, ফ্যাসিবাদি আক্রমণ হচ্ছে। কেন এমনটা হোল? কেন এমন হচ্ছে? গণতান্ত্রিক আন্দোলনের তো এতদিনে ড্যাং ড্যাং করে পুঁজিবাদকে খতম করে বিপ্লবের জয়ডংকা বাজানোর কথা! কারণ, বিপ্লবের জন্য যা দরকার সেই জনসমর্থন তো জনগণ দিয়েছিল। নেতাদের ডাকে হাজার হাজার নওজোয়ান বিপ্লবের আশায় ঝাঁপিয়েও পড়েছিল আন্দোলনে। তাহলে আবার প্রতিক্রিয়া শক্তিশালী হ'ল কেন? বিপ্লবেরই তো শক্তিশালী হওয়ার কথা ছিল। ঈশ্বর করে দিল নাকি? 'মিস্টিসিজম' (মায়া) নাকি? মন্ত্র তন্ত্র আছে নাকি? মন্ত্র তন্ত্র বলে হয়তো তাদের কিছু থাকতে পারে যাঁরা তা বিশ্বাস করেন। কিন্তু মন্ত্র তন্ত্র বলে যদি কিছু না থাকে আর আল্লা বা ঈশ্বরের খেয়াল বলেও যদি কেউ মনে না করেন, তাহলে এটা ঘটছে কেন? এটাই হ'ল আসল প্রশ্ন।

শুধু অর্থনৈতিক দাবি আদায় নয়, শ্রমিকদের মধ্যে যথার্থ বিপ্লবী রাজনৈতিক শক্তির জন্ম দেওয়াই বিপ্লবী ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলোর মূল কাজ

এখানে আমি প্রথমেই লেনিনের একটি কথা আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিই। মজুরদের লেনিন বার বার একটি বিষয়ে 'ওয়ার্ন' (সাবধান) করেছেন। মার্কস থেকে শুরু করে সকলেই বার বার এই গুরুত্বপূর্ণ কথাটি বলেছেন। তাঁরা বলেছেন যে, শুধু অর্থনৈতিক ও গণতান্ত্রিক দাবিদাওয়া নিয়ে শ্রমিকরা যতই মারমুখী লড়াই করুক না কেন, বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে যতই তারা তাদের দাবি ও গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জন করুক না কেন, তাতে তাদের গোলামির অবসান হয় না — তারা যে গোলাম সেই গোলামই থেকে যায়, যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই থাকে। শুধু অর্থনৈতিক ও গণতান্ত্রিক দাবিদাওয়া নিয়ে লড়লেই আর তার সাথে 'মার্কস্বাদ-লেনিনবাদ জিন্দাবাদ', 'পুঁজিবাদ হো বরবাদ' বা 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' ইত্যাদি স্লোগান কিছু যুক্ত করে দিলেই তাদের অবস্থা পাল্টে যাবে না। যদি তাদের লড়াই শুধু 'এক্স্টেনসন অব ডেমোক্রেটিক রাইট্স্'-এর (গণতান্ত্রিক অধিকার সম্প্রসারণের) জন্যই লড়াই হয়, তাহলে যত গণতান্ত্রিক অধিকারই অর্জিত হোক না কেন, মজুরদের 'ইমান্সিপেশন' (মুক্তি) কখনও হবে না। মুক্তি অর্জন করতে হলে শ্রমিকদের বুঝতে হবে যে, গণতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এই সংগ্রামগুলো শুধু অত্যাচারের বিরুদ্ধে

ন্যূনতম অধিকারটুকু নিয়ে বেঁচে থাকার সংগ্রাম ছাড়া আর কিছু নয় এবং একইসঙ্গে এটাও তাদের বুঝতে হবে যে, এইভাবেই দৈনন্দিন দাবি আদায়ের জন্য যে সংগ্রাম গড়ে উঠছে, সেগুলি এই ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করার মতো উপযুক্ত রাজনৈতিক শক্তির জন্ম দেওয়ার একটা প্রচেষ্টা ছাড়া অন্য কিছু নয়। একমাত্র এই আন্দোলনগুলোর মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে মজুরদের মধ্যে উপযুক্ত রাজনৈতিক শক্তির (সংগ্রাম কমিটিগুলির) জন্ম দিতে পারলেই পুঁজিবাদকে উপড়ে ফেলার মতো ' প্রোট্র্যাক্টেড্' (দীর্ঘস্থায়ী) 'ওয়ার' বা বিপ্লবী লড়াই শুরু করা সম্ভব — যে দীর্ঘস্থায়ী লড়াই রাষ্ট্রশক্তির হাজার একটা দমনপীড়নের মুখেও ভেঙে পড়বে না। যেমন করে ভিয়েতনামের মানুষকে 'নাপাম' বোমা দিয়ে, গোটা দেশটাকে মরুভূমি বানিয়ে দিয়েও খতম করা গেল না। শেষ পর্যন্ত আমেরিকাকে মাথা হেঁট করে হটে আসতে হ'ল।

তাই ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সম্বন্ধে মার্কস প্রথম থেকেই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যে — শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়ন করবে কেন? করবে এই কারণে যে, এটা হচ্ছে 'স্কুল অব কমিউনিজম' (সাম্যবাদী শিক্ষার বিদ্যাপীঠ) , সাম্যবাদ সম্পর্কে জ্ঞানের হাতেখড়ি হয় এখানে। সকলে মিলে সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতিদিনের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে এই প্ল্যাটফর্ম থেকে লড়তে গিয়ে, শ্রমিক ঘটনা বিশ্লেষণের, সত্যানুসন্ধানের সুযোগ পায়। সে বুঝতে থাকে কেন বিপ্লব ছাড়া মুক্তি নেই। যথার্থ বিপ্লবীরা ছাড়া আর কেউই প্রতিদিনের লড়াই-এর মধ্য দিয়ে শ্রমিকদের এইভাবে শিক্ষিত করে তুলতে চায় না। অন্যেরা, মেকি বিপ্লবীরা মজুরকে বলে — ইউনিয়ন কর, ইউনিয়ন চালাও আর তারা নিজেরা ইউনিয়নে 'ব্যুরোক্রেসি'র জন্ম দেয়, মজুরকেও তাতে অভ্যস্ত করিয়ে নেয়। এইভাবে ট্রেড ইউনিয়নিজম্ একটি ব্যুরোক্রেসিতে (আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থায়) পর্যবসিত হয়। নেতারা একটা ধারণা গড়ে তোলে যে, তারা সব মস্ত লোক। তাদের কথার দাম আছে। মালিকরা তাদের ভয় করে, খাতিরও করে। আপনারা মনে রাখবেন, এই 'খাতির' আর 'ভয়' হচ্ছে মাসতুতো-পিসতুতো ভাই। এসব নেতাদের দুটোই চাই। তারা মনে মনে চায় যে, মালিকরা তাদের খাতির করুক, সেইজন্য মালিকদের তারা ভয় দেখায়। মজুররাও সেইসব নেতাদেরই ধরে, যাদের ধরলে তারা মনে করে, তাদের কিছু পাইয়ে দিতে পারে। তাই দেখা যায়, যে পার্টিটা শাসন ক্ষমতায় থাকে সেই পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত ইউনিয়নের পাণ্ডাদের মজুররা গিয়ে ধরে, কারণ তারা মনে করে এদের ধরলে মালিকদের কানে জল ঢোকানো যাবে, তাদের কিছু দাবিদাওয়া আদায় করা সম্ভব হবে। এই যখন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায়, তখন সেই ট্রেড ইউনিয়নের দ্বারা মজুরদের মুক্তি আন্দোলন এক পাও এগোয় না। এগোতে পারে না। এই ধরনের মজুর আন্দোলনের সঙ্গে শ্রমিকদের বিপ্লবী আন্দোলনের, মুক্তি আন্দোলনের কোন সম্পর্ক নেই, তা তার ঝান্ডা লালই হোক, সবুজই হোক আর সাদাই হোক। যখন ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের কাজই হয় মজুরদের মধ্যে কেবল ক্ষোভ সৃষ্টি করা, বা যে দল নেতৃত্ব করছে তাদের পাইয়ে দেওয়ার ক্ষমতা সম্পর্কে কেবল মজুরদের মধ্যে মিথ্যা মোহ সৃষ্টি করা তখন বুঝতে হবে সেই দল বা নেতৃত্ব, ইংল্যান্ডের লেবার পার্টি বা আমেরিকার বড় বড় ইউনিয়নের মতোই 'মডারেট ট্রেড ইউনিয়নিজম্' ও 'ইকনমিজম্' (অর্থনীতিবাদ)-এর চর্চা করছে। আপনারা দেখবেন আমেরিকা বা ইংল্যান্ডের এইসব ট্রেড ইউনিয়নগুলো, কখনও কখনও কথায় কথায় গোটা দেশের কলকারখানায় ধর্মঘট করে, উৎপাদন বানচাল করে দেয়। এরা আদতে দেশের 'মনোপলি' (একচেটিয়া) গোষ্ঠীর মধ্যকার বিরোধী একটা অংশ। এদেরকে মনোপলিস্টরা (একচেটিয়া পুঁজিপতিরা) কন্ট্রোল (নিয়ন্ত্রিত) করে, যেমন ইংল্যান্ডের লেবার পার্টি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদেরই ধারক বাহক। তারা যখন ধর্মঘট করে গোটা ইংল্যান্ডকেই অচল করে দেয় তখন সেই ধর্মঘটের পিছনে সাধারণ মজুর উন্মত্তের মত দৌড়তে থাকে এবং ভাবতে থাকে যে, এইখানেই তারা বিপ্লবটা শুরু করেছে বোধহয়। অথচ এর দ্বারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত পড়ে না বরং ইউনিয়নের ধুরন্ধর নেতারা এই ধরণের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের মধ্যে মজুরদের বেঁধে ফেলেছে, আটকে ফেলেছে ভেবে মালিকরা, সাম্রাজ্যবাদীরা মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসে। ভাবে মজাটা ভালই হয়েছে। আর আটকে যাওয়া মজুর, বাঁধা গরুর মতো বুঝতেও পারে না যে নেতাদের শয়তানির কৌশলে তারা বাঁধা পড়েছে। তাই মার্কস, লেনিন বার বার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যে, ট্রেড ইউনিয়ন হচ্ছে 'স্কুল অব কমিউনিজম' (সাম্যবাদী জ্ঞানলাভের বিদ্যাপীঠ)। বলেছেন যে, হাজার হাজার মজুর যারা ময়দানে, প্রাত্যহিক লড়ালড়িতে জড়ো হয়, অহেতুক গরম গরম কথা বলে শুধু হাততালি কুড়োবার আশায় তাদের খেপিও না। যে শত্রুকে জানো তার বিরুদ্ধে আগে-পিছে দশটা বিশেষণ লাগিয়ে বক্তৃতা দিয়ে সময় নষ্ট না করে কিছু কাজের কথা বল। একটা আন্দোলনের সফলতার সম্ভাবনা যদি থাকে তবুও তার যে বিফলতার

দিকগুলো থাকতে পারে সেগুলি সম্পর্কে মজুরদের সচেতন কর। কোন একটা আন্দোলন বিফল হলেও কেন এটা বিফল হ'ল সেটা বোঝাবার সাথে সাথে এর মধ্যেও সফলতার যে দিকগুলো আছে সেগুলোও মজুরদের চেতনার স্তরে এনে দেবার কাজটাই হচ্ছে নেতাদের কাজ।

অথচ মজুর আন্দোলনে এসব বোঝানো হয় না। প্রতিদিনের এই সমস্ত আন্দোলনগুলিকে শেষ পর্যন্ত কোন্ রাজনৈতিক লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যেতে হবে এবং তারজন্য আন্দোলনগুলিকে কীভাবে পরিচালিত করতে হবে, এইসব মজুরদের বলা হয় না, শেখানো হয় না। মজুরদের কাছে শুধু গরম গরম বক্তৃতা দেওয়া হয় — আপনারা মজবুত সংগঠন গড়ে তুলুন, বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হোন, দুর্গ গড়ে তুলুন — এমন দুর্গ গড়ে তুলুন যেখানে কেউ ঢুকতে না পারে। সঙ্গে সঙ্গে মজুররা লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল এবং দুর্গ তৈরি করে ফেলল — এমন দুর্গ যেখানে একটা লোক ভাল কথা বলতে এলেও যদি সে তার দলের বা সংগঠনের লোক না হয় তাহলে তাকে সেই কথা বলতেও দেওয়া হবে না।

আপনারা জানেন, অনেক লাল দুর্গ গোটা দেশে গড়ে উঠেছিল এমনভাবে যেন সেগুলো কোন বিশেষ দল বা সংগঠনের জমিদারি — সেখানে অন্য আর কাউকে ঢুকতে দেওয়া হত না। তা আমি বলি, কেউ ভাল কথা কিছু বললেও যেহেতু সে দলের লোক নয়, যেহেতু এটা আমাদের দুর্গ, সেহেতু তাকে ঢুকতে দেব না বা তার ভাল কথাতেও কান দেব না সেটা কেমন কথা? সমালোচনাটা হয়ত মুক্তি আন্দোলনেরই কাজে লাগতো, কিন্তু যেহেতু দুর্গ গড়া হয়েছে, সেই হেতু কানে তালা লাগানো কি কাজের কথা নাকি? নেতারা বলেছে বিভাগে বিভাগে দুর্গ গড়ে তোল — তার মানে কি এই যে, বুদ্ধি ও যাতে নাক গলাতে না পারে! এর ফল কী হয়েছে? এর ফলে অন্ধতা বাড়ছে। অন্ধতার মনোবৃত্তি ফ্যাসিস্ট সুলভ — তা বুর্জোয়াদের সাহায্য করে। শ্রমিক আন্দোলন, বিপ্লবী আন্দোলন অজ্ঞতার কারবার করে না। তারা যুক্তি, তর্কাতর্কি, আলাপ আলোচনা ও মতাদর্শগত সংঘর্ষে বিশ্বাস করে;কারণ তারা সত্যানুসন্ধানী। আলোচনা, যুক্তি, তর্কাতর্কিতে তারা ভয় পায় না। আলোচনাকে চাপতে চায়, নিরুৎসাহিত করে তারাই যারা 'রং' (ভুল) জায়গায় আছে, যারা প্রতিক্রিয়াপন্থী। তাই তারা কখনও শৃঙ্খলার দোহাই দিয়ে, কখনও বা ঐক্যের দোহাই দিয়ে, দুর্গ-টুর্গ গড়তে হবে এসব কথা বলে আসলে তারা আলাপ আলোচনা চাপা দিতে চায়। তারা তর্ক-বিতর্কে ভয় পায়, যুক্তি বিশ্লেষণে ভয় পায়। তারা একটা মানুষকে বক্তৃতায় বিশ্লেষণ করতে দেখলে ঠাট্টা করে, বলে — ক্লাস নিচ্ছে। যেন শুধু খেপানোর জন্য বক্তৃতা করা দরকার। তারপর খেপে গিয়ে লোকে এখানে ওখানে বিচ্ছিন্ন লড়ালড়িতে মরুক। আর মরলে তো জনতাই মরে, নেতারা তো মরে না। এ সব নেতারা কে কবে কোথায় গুলি খেয়ে মরেছে? এরা মরে না। বিপ্লবীরা কখনও কখনও মরেন। কিন্তু এসব নেতাদের তো পুলিশ 'স্যার্' 'স্যার্' করে মাথায় তুলে রাখে, চারিদিক থেকে ঘিরে রাখে! তাই এই সব নেতারা শুধু লোক খেপায় আর লোক খেপে গিয়ে যত মরে তত বরং এসব নেতাদেরই সুবিধা! দুটো শহীদ দিবস করে শাসকদলকে গালাগালি দিয়ে নির্বাচন বৈতরণী পার হবার কড়ি কিছু জুটে যায় নেতাদের।

সঠিক রাজনৈতিক লাইনই হচ্ছে বিপ্লবের প্রধান শর্ত

আমি বলি বিপ্লবের জন্য মানুষকে তো মরতেই হবে। কিন্তু এত লড়াই, এত মৃত্যুবরণ সত্ত্বেও প্রতিক্রিয়া শক্তিশালী হচ্ছে কী করে? তাহলে আসল কথাটা কী? আসল কথাটা হচ্ছে সঠিক রাস্তা, সঠিক বিপ্লবী তত্ত্ব ও সঠিক রাজনীতি। যে দেশে লড়ছি সেই দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা কী ধরনের, রাষ্ট্রকাঠামো কী প্রকৃতির সেটা ভাল করে বোঝা দরকার। এই সেদিনও চীনের পার্টি তাদের দশম কংগ্রেসে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছে সেটা আমার ভাল লেগেছে। এমন একটা পার্টি যে বিপ্লব ও তারপর সাংস্কৃতিক বিপ্লব করেছে, যে পার্টি একটা এতবড় দেশে হর্তা-কর্তা-বিধাতা, সে বলছে না যে, যেহেতু আমার এত সদস্য, এত জনসমর্থন বা যেহেতু এতগুলি কমিটির সমর্থন আমার পিছনে রয়েছে সেইহেতু আমি ঠিক। তারা কিন্তু বলছে — রাস্তা বা 'বেস পলিটিক্যাল লাইন' (মূল রাজনৈতিক লাইন) ঠিক না হলে, শক্তি বা জনসমর্থন যদি আজ থাকেও, আর্মি থাকলেও, সংগঠন থাকলেও, তা শেষ পর্যন্ত রাখা যাবে না। রাস্তা ভুল হলে আস্তে আস্তে সবই যাবে। একথার দ্বারা এটা ধরেই নেওয়া হচ্ছে যে লাইন ভুল হলেও একটা সময় পর্যন্ত, যতক্ষণ না সাধারণ মানুষ তার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ধরতে পারছে ভুলটা কোথায়, ততক্ষণ পর্যন্ত তার পিছনে জনসমর্থন থাকতে পারে। তা না হলে হিটলার একসময় জার্মানির অবিসংবাদী নেতা হলেন কী করে?

ডিক্টেটর নাসের এবং ইজিপ্টের কর্তারা নেতা হলেন কী করে বা কমিউনিস্টদের দমন করছে কী করে? লাইন 'ইন্‌কারেক্ট' (ভুল) হলেও জনপ্রিয়তা অর্জন করা যায় এবং একটা সময় পর্যন্ত তা ধরেও রাখা যায়। তার বড় প্রমাণ তো আমাদের দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় পর্যন্ত মুসলিম লীগের যে একচ্ছত্র আধিপত্য মুসলিম চাষী, মজুর, মধ্যবিত্তের উপর ছিল, তা থেকেই পাওয়া যায়। কিন্তু বেশিদিন কি এই সমর্থন ধরে রাখতে পারা গেছে? যায়নি। তাই চীনের পার্টি, এতবড় পার্টি, এত লোকজন, জনসমর্থন থাকা সত্ত্বেও বলেছে যে, রাস্তা ঠিক থাকলে একটি লোক নিয়ে যদি পার্টি শুরু হয় তাহলে সে এক থেকে দুই হবে, দুই থেকে পাঁচ হবে এবং এই ভাবে সে রাজনৈতিক শক্তি গড়ে তুলবে ও ক্ষমতা দখল করবে। তাই রাস্তা ঠিক হওয়া একটা প্রধান শর্ত। মার্কস, লেনিন — সবাই একই কথা বলেছেন। বলেছেন, ভিন্ন ভিন্ন ভাষায়। মার্কস বলেছেন যে, যারা সর্বহারা, তারাই একমাত্র এই দুনিয়াকে পাল্‌টাতে পারে। তিনিই প্রথম দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের সাহায্যে দুনিয়াকে পাল্‌টাবার বিজ্ঞানসম্মত পথের সন্ধান দিলেন। বললেন, মজুররা দুনিয়াকে পাল্‌টাতে পারে, কথাটার মানে এই নয় যে মজুর সর্বহারা বলেই সে পাল্‌টাতে পারবে। যেকোন রকমে হাজার হাজার প্রলেতারিয়েত সংগঠিত হয়ে বিপ্লবের নারা (ধ্বনি) লাগালেই পারে না। সেই প্রলেতারিয়েতই পারে যে নিজেকে পরিবর্তিত করে বিপ্লবের উপযোগী করে গড়ে তুলেছে।

বুর্জোয়া অপসংস্কৃতির শিকার বা দুর্দশাগ্রস্ত শ্রমিকের সংস্কৃতি, সর্বহারা সংস্কৃতি নয়

শুধু রাজনৈতিক ভাবে নয়, স্লোগানে নয় — আচার-আচরণে, নীতি-নৈতিকতায়, সংস্কৃতি-রুচিতে বুর্জোয়া অপসংস্কৃতির কূপমণ্ডুকতা থেকে মুক্ত করে নিজের মধ্যে বিপ্লবী নেতৃত্বের জন্ম দিতে সক্ষম হয়েছে যে প্রলেতারিয়েত, সেই একমাত্র দুনিয়াকে পরিবর্তিত করতে পারে। বুর্জোয়া পরিবেশ থেকে অর্জিত বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদ, ভাবধারা ও অপসংস্কৃতির প্রভাব থেকে মজুররা যতদিন না মুক্ত হয়, ততদিন আর্থিক দুর্গতি বাড়লেও সে বিপ্লব করতে পারে না। বুর্জোয়া অপসংস্কৃতির যে রূপ আমরা মজুরদের মধ্যে দেখি, মজুর বলেই সে সংস্কৃতি প্রলেতারিয়েত সংস্কৃতি নয়। একসময় 'ফিলান্‌থ্রপিক আইডিয়া' থেকে কিছু লোক এসেছিল যারা মনে করত — মজুরের মধ্যে যা কিছু সবই বিপ্লবী। তাই মার্কস থেকে লেনিন সবাই তাদের কান মলে দিয়ে বলেছেন যে, 'প্রোলেটারিয়ান কাল্‌চার' (সর্বহারা সংস্কৃতি) মানে 'কালচার ইট্‌সেল্‌ফ্‌ প্রোলেটারিয়েট' হবে না (সংস্কৃতিটা সর্বহারা হবে না)। প্রলেতারিয়ান কালচারের অর্থ এ নয় যে খোদ কালচারই প্রলেতারিয়েত! তাঁরা বলেছেন যে, বুর্জোয়া বিপ্লববাদের আধারে মানবতাবাদী মূল্যবোধ ও উদারতার কাঠামোটি গড়ে উঠেছিল। শ্রমিক বিপ্লবের যুগে, শ্রমিক বিপ্লবের আদর্শকে কেন্দ্র করে, প্রলেতারিয়ান সংস্কৃতি অর্জন করার অর্থ — অজ্ঞ, অশিক্ষিত, বুর্জোয়া অপসংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবিত প্রলেতারিয়েতদের ভাষাগুলি, অভ্যাসগুলি রপ্ত করা নয়। বুর্জোয়া সংস্কৃতি ও দুর্দশাগ্রস্ত জীবনের মধ্যে পর্যুদস্ত হয়ে ভাগ্যের দোহাই দিয়ে, এই জীবনকেই সত্য বলে, নিয়ম বলে, মেনে চলছে যে মজুর, অর্থনৈতিক সুবিধাবাদের গোলকধাঁধায় ফেঁসে আছে যে মজুর — তার থেকে মুক্ত করে অমিত তেজে তাকে খাড়া করে, নতুন আদর্শে বলীয়ান করে, তাকে কমিউনিস্ট করার জন্যই প্রলেতারিয়ান সংস্কৃতি। ভারতবর্ষে দেখছি সম্পূর্ণ উল্‌টো জিনিস। মজুরদের মধ্যে যেতে হবে এবং মিশতে হবে বলে তথাকথিত কমিউনিস্টদের নেশা-ভাঙ করতে, গাঁজা খেতে হয় এখানে। এক সময় বাড়িঘর ছেড়ে সর্বস্ব ত্যাগ করে বিপ্লব করতে কত কর্মী এসেছিল লেবার পার্টিতে[২]। এত বড় একটা পার্টি, যে খোদ মজুরদের মধ্যে এত কর্মী পেয়েছিল, তা এত অধিক পরিমাণে আমরা কোন পার্টিই পাইনি, তার কী করুণ পরিণতিটাই আমরা দেখছি আজ! প্রলেতারিয়ান সংস্কৃতি শেখাতে গিয়ে খুব দুর্দশাগ্রস্ত প্রলেতারিয়েতে পর্যবসিত করে দিল তাদের সবাইকে। কোন কর্মীকে তারা বিপ্লবী হিসাবে গড়ে তুলতে পারেনি। কত ক্যাডারের কী বিরাট সর্বনাশ করে দিল তারা। বুর্জোয়া অপসংস্কৃতির শিকার যে নৈতিকতাহীন প্রলেতারিয়েত, তাদের জাগাতে গিয়ে নিজেরাই তার শিকার বনে গেল। তাদের সমস্ত সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে গেল শুধু এই চোরাবালির পথ বেয়ে। তাই মার্কসবাদী আন্দোলন বা মজুর আন্দোলনে জয়যুক্ত হওয়ার প্রধান শর্ত হচ্ছে যে, মজুর যদি নিজেকে পরিবর্তিত করতে না পারে তাহলে সে দুনিয়াকেও পরিবর্তিত করতে পারবে না। সেজন্য সর্বহারা সংস্কৃতির আধারে সঠিক রাজনৈতিক লাইনকে ভিত্তি করে যথার্থ বিপ্লবী দলের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রশ্নটি বিপ্লবের প্রশ্নটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মজুরের হাতে যেটি একমাত্র অস্ত্র বা বিজ্ঞান সেই মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে ভিত্তি করে মজুরকে শ্রেণীসংগ্রামের অন্তর্নিহিত নিয়ম ও রূপ, দেশের অর্থনৈতিক-

সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির যথাযথ বিশ্লেষণটি সঠিকভাবে বুঝতে হবে। অভাব, অনটন, অত্যাচার, জুলুমকে কেন্দ্র করে যে লড়াইগুলি সমাজ অভ্যন্তরে প্রতিনিয়ত গড়ে উঠছে, তাকে শেষ পর্যন্ত কোথায় কোন্ লক্ষ্যে নিয়ে যেতে হবে সেকথা বুঝতে হবে — কে শোষণ করছে, কার বিরুদ্ধে লড়াই — এগুলো বোঝাই হচ্ছে শ্রমিক আন্দোলনের মূল কথা। আপনারা লড়াই চান এবং এর জন্য সংগঠন চান। আর লড়াই ও সংগঠন হলেই খুশি হন। এরকম হলে চলবে না। লড়াই কেন? সংগঠন কেন? লড়াইয়ের জন্যই নিশ্চয়ই লড়াই নয়। সংগঠনের জন্যই নিশ্চয়ই সংগঠন নয়। তাহলে লড়াই বলুন সংগঠন বলুন এ সবগুলিই হচ্ছে বিপ্লবের জন্য, শ্রমিকদের মুক্তির জন্য। কার হাত থেকে মুক্তি? কে শোষণ করছে? বাধাটা কোথায়? রাম আমাকে শোষণ করছে আর আমি যদি শ্যামের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য প্রস্তুত হতে থাকি, তাহলে আমি কোনদিনই মুক্তি অর্জন করতে পারব না। তাই সঠিক রাস্তা নির্ণয় করতে পারাটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা। সততা, নিষ্ঠা, আত্মত্যাগ, সংগ্রামী মন এগুলি সব থাকলেও রাস্তা যদি ভুল হয় তাহলে তার দ্বারা পণ্ডশ্রম ছাড়া আর কিছুই হবে না। মনে রাখবেন এগুলি হচ্ছে 'এলিমেন্টারি বেস কোয়ালিটি' (প্রাথমিক মৌলগুণ) যা ব্যতিরেকে বিপ্লবীরা কেন প্রতিক্রিয়াশীলরাও কিছু করতে পারে না। ফ্যাসিস্ট নাৎসিরা যারা জার্মানিতে ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রশক্তি গড়ে তুলেছিল, বিপ্লবকে রুখেছিল, প্রতিবিপ্লবের জন্ম দিয়েছিল — জাপানি সাম্রাজ্যবাদ যারা তাদের জঘন্য সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও জুলুম সমস্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির উপর চালু করেছিল, গত মহাযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যারা এত বড় ধম্‌কি তুলে ধরেছিল, তারা বুঝে হোক না বুঝে হোক একটি নৈতিক বল, সততা ও নিষ্ঠা নিয়েই কাজ করেছিল। তারা 'হারিকিরি' করত। হারিকিরি কথাটা শুনেছেন নিশ্চয়ই। এই জাপানি সাম্রাজ্যবাদের অনুচরেরা যখন মনে করত যে তারা রাষ্ট্রের সাথে, মিলিটারির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, যে কর্তব্যটি তাদের করার কথা তা করতে পারেনি, তখন তারা নিজেরা নিজেদের শাস্তি দিত। এটা 'ডেডিকেশন' (নিষ্ঠা) ও 'ডিসিপ্লিন'-এর (শৃঙ্খলার) চিহ্ন। নাৎসিদের জীবনযাত্রার কথা পড়লে, তাদের শৃঙ্খলার কাহিনী পড়লে বুঝতে পারবেন যে এটা এক ধরনের শৃঙ্খলা, এক ধরনের 'মিলিট্যান্সি' (জঙ্গি মনোভাব) যা প্রতিক্রিয়াশীলদেরও দরকার। যারা কিছু করতে চায় তাদের প্রত্যেকেরই এটা দরকার। কিন্তু যেটা সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ জিনিস সেটা হচ্ছে 'বেস পলিটিক্যাল লাইন' (মূল রাজনৈতিক লাইন) সঠিক কিনা, 'মেন পলিটিক্যাল অ্যাপ্রোচ' (মূল রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি) ঠিক কিনা। 'অনেস্টি' (সততা) আছে অথচ যে বস্তুটি আপনি গড়তে চাইছেন তার সম্পর্কে আপনার কোন সঠিক বিজ্ঞানসম্মত ধারণা নেই, তাহলে আপনি তো তা গড়তে পারবেন না। ধরুন টিঙ্কচার আয়োডিন তৈরি করতে যে 'ইন্‌গ্রেডিয়েন্ট্‌স্' (উপাদানগুলি) একত্রে মেলাতে হয় তা আপনি জানেন না। চুন, বালি আর সুরকি মিলিয়ে ঐ জিনিস তৈরি করতে গিয়ে আপনি কঠিন পরিশ্রম করতে পারেন, উপোস করতে পারেন, এমনকী জান দিতে পর্যন্ত প্রস্তুত। নিষ্ঠা ও সততার ক্ষেত্রে কোন ঘাটতি আপনার নেই বলেই কি আপনি তা তৈরি করতে পারবেন? সততা, নিষ্ঠা, একাগ্রতার দরকার আছে বলে শুধু এই 'কোয়ালিটি'গুলোকে মূলধন করে কোনও মনগড়া ধারণা দিয়ে কি কেউ টিঙ্কচার আয়োডিন-টা তৈরি করতে পারেন? রাজনীতি-সমাজনীতিতেও একথাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, অত্যন্ত জরুরি। আপনাদের বুঝতে হবে, ভারতবর্ষের এই বিপ্লবটা কোন্ ধরনের বিপ্লব? ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক শোষণের মূল কারণ কী, এর রাষ্ট্রের চরিত্র অর্থাৎ কোন্ কোন্ শ্রেণী এটি দখল করে আছে — এই প্রশ্নগুলি সম্পর্কে ধারণাটা যতক্ষণ না পরিষ্কার হচ্ছে, ততক্ষণ বিপ্লবের মূল রাস্তা, যাকে আমরা মূল রণনীতি ও রণকৌশল বলি, তা আমরা ঠিক করতে পারব না। এইখানে যদি মনগড়া ধারণার ওপর, ভুল সিদ্ধান্তকে ভিত্তি করে, বিপ্লবের জন্যও কেউ একটা দল গঠন করেন, তাহলে মানুষের দুঃখ-দুর্দশাকে কেন্দ্র করে লড়তে থাকলে তাঁরা হয়ত কিছুদিনের জন্য মানুষকে সংগঠিত করে একটি শক্তিশালী পার্টিও গড়ে তুলতে সক্ষম হবেন, কিন্তু বিপ্লব করতে পারবেন না। বরং এর দ্বারা মানুষের মধ্যে লড়াই এর যে আকাঙ্ক্ষা রয়েছে, ভুল পথে পরিচালিত হওয়ার মধ্য দিয়ে, বিপ্লবী শক্তি নিঃশেষিত হবে — ফলে এরই ফাঁকে পুঁজিপতি ও প্রতিক্রিয়াশীলরাই আরও বেশি শক্তি সঞ্চয় করতে সক্ষম হবে। সেজন্য ভারতবর্ষের মূল সমস্যাগুলি কী এবং কেন তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে তাকে ভাল করে আমাদের বুঝতে হবে। আমার বিচারে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক জীবন আলোড়িত হচ্ছে তিনটি মূল সমস্যাকে কেন্দ্র করে। সাংস্কৃতিক অবক্ষয়, যে সম্পর্কে আমি এর আগে আলোচনা করেছি, তাকেও ভালভাবে বুঝতে হলে এই তিনটি মূল সমস্যাকে ভাল করে বুঝতে হবে।

ভারতবর্ষের সমাজ জীবনে তিনটি মূল সমস্যা

আমাদের সমাজ জীবনের সমস্ত সমস্যা জড়িয়ে আছে যার সঙ্গে তার মধ্যে প্রধান যেটি, সেটি হচ্ছে ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা। কিছুতেই এই সমস্যা রোধ করা যাচ্ছে না। একটা করে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে আর বেকার সংখ্যা বেড়েই চলেছে। কেন এটা হচ্ছে? ওরা বলছে জনসংখ্যাবৃদ্ধিই এর মূল কারণ। একথা সত্য কি না, এটি যথার্থই মূল কারণ কি না, তা বিচার্য বিষয় হতে পারত যদি তার আগে তারা প্রমাণ করতে পারত যে, দেশে যে 'রিসোর্স' (সম্পদ) অর্থাৎ উৎপাদিকা শক্তি ও শ্রমশক্তি রয়েছে তার 'ওয়েস্টেজ' (অপচয়) হচ্ছে না, 'করাপ্শন' (দুর্নীতি) নেই, 'ওয়েস্টফুল এক্সপেন্ডিচার' (অপব্যয়) নেই, 'ইন্স্ট্লড্ ক্যাপাসিটি আইড্ল্' নয় (উৎপাদিকা শক্তি অলস হয়ে বসে নেই), তার পুরো ব্যবহার হচ্ছে বা ব্যবহার করার প্রকৃত চেষ্টা হচ্ছে, সেখানে কোন কার্পণ্য নেই। তারপর অর্থাৎ এসব করেও যত লোককে কাজ দেওয়ার কথা তা দেওয়া যাচ্ছে না — কেবলমাত্র তখনই বাড়তি জনসংখ্যা একটা সমস্যা হিসাবে বিচার্য বিষয় হতে পারতো। কিন্তু আমরা দেখছি উল্টো জিনিস।

এখানে যে উৎপাদিকা শক্তি রয়েছে তারই পুরো ব্যবহার হচ্ছে না। দুর্নীতি ও অপব্যয় প্রতিদিন বেড়ে চলেছে, সীমা অতিক্রম করছে। তাহলে কী দেখা যাচ্ছে? বাড়তি জনসংখ্যার জন্যই কি উৎপাদিকা শক্তিকে পুরো কাজে লাগানো যাচ্ছে না? দুর্নীতি ও অপব্যয়কে বন্ধ করা যাচ্ছে না? তাহলে এটা তো ধোঁকা দেওয়ার কথা। আর এই ধোঁকাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য 'টেক্নোক্র্যাট'-দের (বিশেষজ্ঞ) পিছনে, কমিশন-কনফারেন্সের পিছনে কোটি কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে। এখন দেশটা হয়েছে 'টেকনোক্র্যাট' নামক একদল মূর্খের স্বর্গরাজ্য। আমাদের দেশে বিশেষজ্ঞ মানে পণ্ডিত নয়, বিশেষ ভাবে অজ্ঞ — মহামূর্খ। না হলে 'ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যার মূল কারণ হচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি' — তারা এরকম ব্যাখ্যা দিতে পারত না। জনসংখ্যাবৃদ্ধির সমস্যা একটা সমস্যাই নয় একথা আমি বলতে চাইছি না। আমি যেটা বলতে চাই তা হচ্ছে এই যে, শাসক ও শোষকশ্রেণী উল্টোপাল্টা বা নানা কথার চাতুরিতে বেকার সমস্যার সঙ্গে জড়িত যে প্রশ্নগুলি তাকে চাপা দিতে চাইছে। বাড়তি জনসংখ্যার দোহাই দিয়ে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাতে চাইছে। মূল জিনিসটিকে 'সাইড ট্র্যাক' করছে (পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে)।

তাহলে বেকারদের চাকরি দেওয়া যাচ্ছে না কেন? নতুন নতুন শিল্প, কলকারখানা গড়ে তোলার ভিত্তিতেই তো একমাত্র বেকারদের কাজ দেওয়া যায়। বসিয়ে বসিয়ে 'টপ-হেভি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন' (মাথাভারী প্রশাসন) করে কত লোককে কাজ দেওয়া যায়? তার একটা সীমা আছে ও তার কুফলও আছে। একটা 'ইন্ফ্লেটেড আর্মি' (স্ফীতকায় সৈন্যবাহিনী), 'ইনফ্লেটেড পুলিশ' (স্ফীতকায় পুলিশবাহিনী) বসে বসে খাচ্ছে। তার কুফল সমাজজীবনে বর্তাতে বাধ্য। এর ফলে 'প্যারাসাইটিজম্' (পরগাছাবৃত্তি) আমাদের 'অ্যাড্মিনিস্ট্রেটিভ অ্যাকটিভিটি'-তে (প্রশাসনিক কাজকর্মে), সমস্ত 'ফিল্ড্ অব অ্যাক্টিভিটি'-তে (সমাজজীবনের সর্বক্ষেত্রে) 'প্রিভেল' (বিরাজ) করবে। কিন্তু সেটা অন্য কথা। 'ন্যাশানাল ওয়েস্টেজ'-এর (জাতীয় সম্পদের অপচয়ের) কথাও না হয় ছেড়ে দিলাম। কিন্তু কত লোককেই বা এভাবে কাজ দেওয়া সম্ভব? আর একটা নতুন 'এমপ্লয়মেন্ট অ্যাভেনিউ' (চাকরি দেওয়ার রাস্তা) আজকাল হয়েছে। সেটা হচ্ছে সেবাদল বা 'ভলান্টিয়ার' বাহিনী গঠন। রাজনৈতিক দলগুলো নিজেরাই এক একটা 'এন্টারপ্রেনিওর' বা 'বিজনেস কন্সার্ন' (ব্যবসা প্রতিষ্ঠান) হয়ে দাঁড়িয়েছে — যেখানে কর্মখালি আছে, চাকরি দেওয়া যায়। অর্থাৎ পার্টির হয়ে লাঠি ধরলে, ভলান্টিয়ারি করলে, নির্বাচনে কাজ করলে, তার বিনিময়ে ৫ টাকা ১০ টাকা রোজ পাবেন। এটা এদেশে শুরু হয়েছে। একটা বিরাট সংখ্যক 'আনএমপ্লয়েড ইয়ুথ'-কে (বেকার যুবকদের) এইভাবে কাজ দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে, যা দুনিয়ার আর কেউ কোনদিন শোনেনি। তৃতীয়ত, এদেশে বড় বড় জোতদার, মহাজন, রাঘববোয়াল, কালোবাজারি, পাইকাররা আর্থিক দুর্দশাগ্রস্ত মানুষদের একটা বিরাট সংখ্যাকে চাল পাচারের কাজে নিযুক্ত করেছে। এই 'ব্ল্যাক মার্কেটিং'-এর (কালোবাজার) মতো একটা 'আনএথিক্যাল মিন্স্ অব লাইভ্লিহুড' (দুর্নীতিপূর্ণ জীবনযাপনের পথ) এদেশে একটা 'ওপেন থিং' (প্রকাশ্য বিষয়) হয়ে দাঁড়িয়েছে। খোলাখুলি ভূয়া রেশনকার্ডের ভিত্তিতে রেশনের চাল, চিনি প্রভৃতি বিক্রি হচ্ছে অন্যত্র বেশি দামে। একটা দেশের সরকার বসে বসে সব কিছু দেখছে, লজ্জা নেই। তাহলে সেদেশে কোন 'মরাল স্ট্যান্ডার্ড' (নৈতিক মান) থাকে না কি? সকলেই তাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। যাই হোক, এইভাবে নানান পথে মানুষের কর্মসংস্থানের প্রচেষ্টা, বেকার সমস্যার চাপ যা প্রতিদিনই বাড়ছে তাকে কমাতে পারে না কি? একমাত্র শিল্পবিকাশের পথ

খুলে দিতে পারলেই এর সুষ্ঠু মীমাংসা সম্ভব। আর শিল্পবিকাশের পথ উন্মুক্ত হওয়ার সাথে যুক্ত হয়ে আছে গ্রামীণ অর্থনীতির 'মডার্নাইজেশন অ্যান্ড মেকানাইজেশন', আধুনিকীকরণ ও যন্ত্রীকরণের প্রশ্নটি। কৃষি অর্থনীতির আধুনিকীকরণ না হলে শতকরা ৭৫ থেকে ৮০ জন মানুষ যারা গ্রামে বাস করে, তাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করা সম্ভব নয়। আর কৃষি অর্থনীতির আধুনিকীকরণ সম্ভবই নয় যদি শিল্পের অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখা না যায়। কারণ শিল্পের অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে পারলে, কৃষির আধুনিকীকরণের ফলে গ্রামে যে বাড়তি লক্ষ লক্ষ বেকার হবে তাদের কাজ দেওয়া সম্ভব হবে। কিন্তু শহরে কলকারখানায় এমনিই যেখানে লালবাতি জ্বলছে সেখানে বেকারের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই যাচ্ছে। যে কারখানাগুলি চলছিল সেগুলি যেখানে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সেখানে কৃষির আধুনিকীকরণ হবে কী করে? আর কৃষির আধুনিকীকরণ না হলে গ্রামের অবস্থার উন্নতি হবে না, বাজারে 'পারচেজিং ক্যাপাসিটি' (ক্রয়ক্ষমতা) বাড়বেনা অর্থাৎ 'এক্সটেনশন অব মার্কেট' (বাজারের সম্প্রসারণ) হবে না। আর বাজার সম্প্রসারণ না হলে উৎপাদনের 'আর্জ' (তাগিদ) আসবে কোত্থেকে? এটা একটা 'ভিসিয়াস্ সার্কেল'-এর (বিষচক্র) মত দাঁড়িয়ে আছে। তা হলে এই প্রশ্নগুলোর সাথে জড়িয়ে আছে কী?

উৎপাদনের অগ্রগতিতে আমাদের দেশে বাধার সৃষ্টি করছে কে? 'ইন্‌ভেস্টমেন্ট অব ক্যাপিটাল'-এর (পুঁজি লগ্নি করা) 'প্রবলেম'-টা (সমস্যা) কী? এটা পরিষ্কার যে, পুঁজির সমস্যাটি মূল সমস্যা নয়। মূল কারণ হচ্ছে — বাজার নেই। তাহলে বাজারের সমস্যা কার? পুঁজিবাদের না সামন্ততন্ত্রের? এটাই হচ্ছে 'ক্রাক্স্ অব দি প্রবলেম' (সমস্যার মূল)। সামন্ততন্ত্র কতটা আছে বা না আছে এই তর্কের মধ্যে আমি যেতে চাই না। আমার কাছে এটা 'মোস্ট ইর্‌রিলেভেন্ট কোয়েশ্চেন' (অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন)। প্রথমত আমাদের দেশে 'ল্যান্ড রিলেশনে'র (ভূমি সম্পর্কের) ক্ষেত্রে সামন্ততন্ত্র নেই। সময় থাকলে তা আরও বিশদ ব্যাখ্যায় যুক্তি ও তথ্য দিয়ে প্রমাণ করে দিতাম। কিন্তু তর্কের খাতিরে না হয় ধরাই গেল যে সামন্ততন্ত্র কোথাও কোথাও ভূমি সম্পর্কের ক্ষেত্রে এখনও বর্তমান। মার্কসবাদ বলছে — 'মিক্সড ফেনোমেনন' (মিশ্র ঘটনা) বিচারের ক্ষেত্রে সেই 'ফেনোমেনন'-এর মূল বা 'ডমিন্যান্ট ক্যারাক্টারিস্টিক' কোন্‌টা, তা দিয়েই ফেনোমেনন-টির চরিত্র বিচার করতে হয়। এখন দেখা যাক ভারতবর্ষের অর্থনীতির মূল বৈশিষ্ট্য কী? পুঁজিবাদ না সামন্ততন্ত্র? ভারতবর্ষের অর্থনীতির মূল ধাঁচাটা সামন্ততান্ত্রিক না পুঁজিবাদী?

কৃষি অর্থনীতি সমেত ভারতবর্ষের গোটা অর্থনীতিতে একচেটিয়া পুঁজির নিয়ম চালু রয়েছে

তাহলে কথা হ'ল, এই যে ইস্পাত উৎপাদন এদেশে ব্যাহত হচ্ছে — এটা করছে কারা, সামন্তীরা? না কি এটা হচ্ছে পুঁজিবাদী বাজার সঙ্কটের জন্যই? এখানে যে 'প্রোডাক্টিভ ক্যাপাসিটি আইড্‌ল্' (উৎপাদিকা শক্তি অলস) হয়ে বসে আছে এর কারণ কি পুঁজিবাদী বাজার সঙ্কট নয়? সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক আজ অকার্যকরী হয়ে গেছে। 'স্ট্যাটিস্‌টিক্স্' (পরিসংখ্যান) দিয়ে যদি কেউ দেখানও যে কিছু লোকের হাতে এখানে জমি আছে যাদেরকে কেউ কেউ আবার বলছেন 'ক্যাপিটালিস্ট ল্যান্ডলর্ড্‌স্' (পুঁজিবাদী বৃহৎ জোতের মালিক) তাহলেও এটা প্রমাণ হয় না যে, সামন্ততন্ত্র বা আধা সামন্ততন্ত্র গ্রামীণ অর্থনীতিতে 'ডমিন্যান্ট প্রোডাকশন রিলেশন' (মূল উৎপাদন সম্পর্ক) হিসাবে বিরাজ করছে। কৃষি অর্থনীতিতে 'ক্যাপিটালিস্ট ল্যান্ডলর্ডিজম্' বলে একটা কথা আছে ঠিকই। ইংল্যান্ডে আছে। একটা সময় আমেরিকাতেও কিছুকাল ধরে কতকগুলো অঞ্চলে তা গড়ে উঠেছিল। তাদের যে ক্যাপিটালিস্ট ল্যান্ডলর্ড বলা হত সেটা তো পুঁজিবাদের সঙ্গে সম্পর্কিত। সেটা তো পুঁজিবাদের সঙ্গে সামন্তী অভ্যাসের খাদ হয়ে মিশে যাওয়ার ব্যাপার। পুঁজিবাদ উচ্ছেদের পথেই তার অবলুপ্তি। পুঁজিবাদকে রেখে তাকে পাশ কাটিয়ে গিয়ে এই সামন্তী অভ্যাসকে উচ্ছেদের কোন জায়গাই সেখানে তো নেই। কিন্তু এখানে এইসব নানা আগডুম বাগডুম কথা তুলে বিপ্লবের আসল প্রশ্নটিকে গোলমাল করে দেওয়া হচ্ছে।

রাষ্ট্র এখানে পুঁজিপতিশ্রেণীর হাতে, বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে। রাষ্ট্র-উচ্ছেদের লড়াই-ই হচ্ছে বিপ্লব। মজুররা যে লড়বেন, সংগঠন করবেন — তা তো শেষ পর্যন্ত এই শোষণমূলক রাষ্ট্রকেই উচ্ছেদ করার জন্য। এর মানে হ'ল একটা শ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত হতে বাধ্য করবেন, একটা অর্থনৈতিক সামাজিক ব্যবস্থাকে আঘাত করে সরিয়ে দেবেন। কিন্তু এই যে শ্রেণী ক্ষমতাচ্যুত হবে, সেটা কোন্ শ্রেণী? আঘাত করবেন কোন্ শ্রেণীর অর্থনীতিকে, কোন্ ব্যবস্থাকে? পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থা, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা না অন্য কিছু? অথচ

এই মূল বিষয়টি গুলিয়ে দেবার জন্য অনেকে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তী ব্যবস্থার সাথে সাথে একচেটিয়া পুঁজিবাদের বিরুদ্ধেও স্লোগান তুলছেন। একচেটে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে তো সবাই এমনকী ছাত্র পরিষদ, যুব কংগ্রেসও স্লোগান দিচ্ছে। সি পি আই-সি পি আই (এম) তারাও এই একই সুরে স্লোগান দিচ্ছে। সকলের ধাপ্পা এক। একচেটে পুঁজি বা কোন একজন ব্যক্তিগত মনোপলিস্ট যেমন টাটা বা বিড়লার বিরুদ্ধে লড়াইটা কি ব্যক্তির বিরুদ্ধে লড়াই, নাকি পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে, বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়াই? তাই স্লোগানটা শ্রেণীর বিরুদ্ধে হওয়া দরকার। একচেটে পুঁজিপতি একটা আলাদা কোন শ্রেণী নয়। তারা একটা গোষ্ঠী। 'ফিনান্সিয়াল অলিগার্কি (ধনকুবের গোষ্ঠী) বা 'ফিনান্স ক্যাপিটাল'-এর (লগ্নিপুঁজির) অধিকারী হল ব্যাঙ্কিং ও শিল্পগুলির মালিক গোষ্ঠী। আমরা যে বুর্জোয়াশ্রেণীকে আঘাত করতে চাই সেই শ্রেণীর নেতা হচ্ছে এই গোষ্ঠীটা। কিন্তু নেতাকে সামনে রেখে শ্রেণীকে লক্ষ্য না করার মানে যে পুঁজিবাদ আমার মূল শত্রু তাকেই আড়াল করা। তাহলে বুর্জোয়াশ্রেণীকে আড়াল করে কি আমরা বুর্জোয়াশ্রেণীকে হটাতে পারি? দেখবেন মার্কস, এঙ্গেলস এবং সেদিনও চীনের পার্টির দশম কংগ্রেসে চৌ-এন-লাইও নানা ভাষায় এই কথাটাই বলেছেন যে, আমাদের লড়াই কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয়। ব্যক্তি চলে গেলেও শ্রেণী যতক্ষণ থাকবে, মনোপলি (একচেটিয়া পুঁজি) আবার জন্ম নেবে। মনোপলি মানে বিড়লা নয়। মনোপলি হচ্ছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার, বুর্জোয়া শ্রেণীশাসনের, একটি অনিবার্য ফল। তাই পুঁজিবাদ যতক্ষণ থাকছে, ততক্ষণ বিড়লা গেলে তস্য বিড়লার সৃষ্টি হবে। সেজন্য টাটার বিরুদ্ধে, বিড়লার বিরুদ্ধে বা একজন কারখানা মালিকের বিরুদ্ধে যখন লড়াই হয় তখন সেটা যদি পুঁজিবাদ উচ্ছেদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পরিচালিত না হয় — জনতাকে, শ্রমিকশ্রেণীকে বুর্জোয়া শ্রেণীশাসনের উচ্ছেদের পরিপূরক বিপ্লবী চেতনা ও আদর্শে সংগঠিত করা না হয় তাহলে লড়াইয়ের মধ্যে যতই বিপ্লবী বুক্‌নি থাকুক না কেন তা আসলে পুঁজিবাদকে কোথাও আঘাত করে না, বিন্দুমাত্র আঘাত করে না।

ভারতবর্ষের বিপ্লব পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব

তাহলে দেখা যাচ্ছে এইসব মেকি বিপ্লবী দলগুলির তথাকথিত একচেটিয়া পুঁজিবাদ বিরোধী স্লোগানের অর্থ হ'ল এদেশের 'অ্যান্টি-ক্যাপিটালিস্ট রেভোলিউশন'-কে (পুঁজিবাদ বিরোধী বিপ্লবকে) আড়াল করবার জন্য, পুঁজিবাদকে রক্ষা করার জন্য টাটাকে বা বিড়লাকে 'স্কেপগোট' করা ছাড়া আর কিছু নয়। বিপ্লবকে বোঝার জন্য তাই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও সহজ কথাগুলোকে এভাবে এদেশে গোলমাল করে দেওয়া হচ্ছে। যেখানে রাষ্ট্র বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে সেখানে বুর্জোয়াশ্রেণীকে রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে উচ্ছেদের বিপ্লবকেই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পরিভাষায় বলা হয় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। রাষ্ট্র ক্ষমতায় বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে দু'দশটা সামন্তী থাকলে, তার দ্বারা বিপ্লবের স্তর পাল্‌টে যায় না। রুশ বিপ্লবের ইতিহাস পড়লে দেখতে পাবেন, ফেব্রুয়ারিতে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর যে কেরেন্‌স্কি সরকার গঠিত হয় তাতে মন্ত্রীসভায় প্রতিরক্ষা, অর্থ, পররাষ্ট্র প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলি সবই 'জার' পরিবারের লোকদের দখলে ছিল। তা সত্ত্বেও 'এপ্রিল থিসিসে' লেনিন বলছেন যে, যে মুহূর্তে নিকোলাই জারকে হটিয়ে রাষ্ট্রশক্তি বুর্জোয়ার হাতে চলে গিয়েছে সেই মুহূর্ত থেকেই রাশিয়ার বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে প্রবেশ করেছে, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছে রাজনৈতিক দিক থেকে।

লেনিন কি জানতেন না যে তখনও কুলাকরা, কুলাকিজম রয়েছে? জারের প্রভাব রয়েছে? সাম্রাজ্যবাদীদের প্রচুর পুঁজি খাটছে এবং অর্থনীতিতে তখনও সাম্রাজ্যবাদীদের প্রভাব পুরোমাত্রায় বর্তমান রয়েছে? একদল মার্কসবাদী সেখানেও ছিল, যারা এই সমস্ত উল্লেখ করে চিৎকার করেছে যে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের পুরো উচ্ছেদ না করে, একলাফে কী করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হবে! লেনিন আচ্ছা করে তাদের কান মলে দিয়ে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন — মার্কসবাদ 'ইকনমিক ডিটারমিনিজম' (অর্থনৈতিক নিশ্চয়তাবাদ) নয়। বলেছিলেন ঃ 'পলিটিক্স মাস্ট টেক প্রিসিডেন্স ওভার ইকনমিক্স্ অ্যান্ড টু আর্গু আদারওয়াইজ ইস টু ফরগেট এবিসি অব মার্কসইজম' (রাজনীতি অর্থনীতির আগে; বিষয়টিকে অন্যভাবে দেখার অর্থ হ'ল মার্কসবাদের অ আ ক খ ভুলে যাওয়া)। রাজনীতি এবং অর্থনীতির মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক, সেটা এ রকম যান্ত্রিক নয় যে, রাজনীতি শুধু অর্থনীতিকে অনুসরণ করে গড়ে উঠে। যেমন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের প্রভাব থাকা সত্ত্বেও, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বুর্জোয়ারা রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্ত করার মধ্য দিয়ে একটি বিষয় সামনে এসে গেল। শুধু এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে লেনিন

বললেন — অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনগুলি সাধিত হওয়ার আগেই যেহেতু বুর্জোয়ারা আজ রাষ্ট্রক্ষমতায় এসে গেছে, তাই তাকে না হটিয়ে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রকে আজ আর একচুলও হটানো সম্ভব নয়। 'ইন্ দ্যাট রেসপেক্ট্ অ্যান্ড টু দ্যাট এক্সটেন্ট' সেই অর্থে এবং ততটুকু পরিমাণে রাশিয়ার বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং যতদিন না বিপ্লব সমাধা হচ্ছে ততদিন এ দুটো জিনিস খাদ হয়ে পাশাপাশি চলবে।

অথচ আমাদের দেশে একদল তথাকথিত মার্কসবাদী মার্কস-লেনিনের কাছ থেকে কোন শিক্ষাই না নিয়ে, রাষ্ট্রটি যে বুর্জোয়া রাষ্ট্র এবং বিপ্লবের স্তর নির্ধারণের ক্ষেত্রে সেটাই যে মূল প্রশ্ন তা একেবারে খেয়াল না করে এদেশের গ্রামীণ অর্থনীতিতে সামন্ততন্ত্রের অস্তিত্ব আছে বলে চিৎকার করছেন। তাদের যুক্তি হচ্ছে — গ্রামে এখনও মান্ধাতা আমলের সেই চাষবাসের পদ্ধতি, টুকরো টুকরো করে ছোট ছোট প্লটে জমি চাষ হয়, মুষ্টিমেয় লোকের হাতে বেশিরভাগ জমি আছে। বৃহদাকার কৃষি-খামার ও উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি বা উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে যা দেখতে পাওয়া যায় তা এখানে অনুপস্থিত ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সম্পর্কে লেনিনের একটি কথা আছে। তিনি আমাদের এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন। 'অ্যাগ্রেরিয়ান রিফর্ম' সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেনিন বলেছেন যে, খণ্ড খণ্ড জমিতে মান্ধাতা আমলের পদ্ধতিতে চাষ অথবা আধুনিক পদ্ধতিতে বৃহদাকার কৃষি-খামার, উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতির প্রবর্তন ইত্যাদি কোনটাই কৃষি অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক, পুঁজিবাদী বা সামন্ততান্ত্রিক চরিত্র নির্ধারণ করে না। উৎপাদন সম্পর্ক ও কৃষিতে উৎপাদিত সামগ্রীর ব্যবসা-বাণিজ্যের রীতিটা কোন্ ধরনের, তা দিয়ে বিচার হয় কৃষি অর্থনীতির সত্যিকারের চরিত্র।

অর্থাৎ কৃষিতে যে উৎপাদন হয় তার পণ্যের চরিত্র কী? তার ব্যবসা-বাণিজ্যের রীতিটা কী? সেটা কি 'লোকালাইজ্ড্ এগ্রিকালচারাল মার্কেট'-এর (স্থানীয় কৃষি বাজারের) পণ্য? না কি পুঁজিবাদী জাতীয় বাজারের 'ট্রেড অ্যান্ড কমার্সে'র (ব্যবসা-বাণিজ্যের) পণ্য? নাকি 'সোস্যালিস্ট ইকনমিক প্ল্যানিং'-এ (সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনায়) 'সোস্যালি নেসেসারি থিংস'-এর (সামাজিক প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর) 'এক্সচেঞ্জ' (বিনিময়) হওয়ার জন্য গভর্নমেন্ট 'বার্টার' (সমমূল্যে বিনিময়) যেমন করে থাকে, তেমনি করে একে কাজে লাগাচ্ছে এবং বাজারের মারফত আসছে, জনগণের মধ্যে যাচ্ছে এবং ধীরে ধীরে 'কমোডিটি সার্কুলেশন' (বাজার মারফত পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থা) কমিয়ে আনার উদ্দেশ্য প্রভৃতিকে সামনে রেখে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে? কোন্ উদ্দেশ্যে উৎপাদন হচ্ছে এবং উৎপাদিত পণ্য নিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যই বা কী রীতিতে চলছে তার ভিত্তিতেই কৃষি অর্থনীতির চরিত্র নির্ধারিত হয়।

আমাদের এখানে কী হচ্ছে? এখানে জমির মালিক যারা তারা জমিতে পুঁজি খাটাচ্ছে এবং উদ্বৃত্ত পণ্য বাজারে বিক্রি করে তার থেকে মুনাফা করছে। মূলত ভোগের জন্য এখানে উৎপাদন হচ্ছে না। উৎপাদনের উদ্দেশ্য এখানে বাজারে বিক্রি করে সর্বোচ্চ লাভ করা। ফলে জমিও 'ক্যাপিটাল' বা পুঁজিতে, 'ক্যাপিটালিস্ট মিন্স্ অব প্রোডাকশন' — পুঁজিবাদী উৎপাদনযন্ত্রে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। কৃষিতে উৎপাদন হয়ে, বাজারে বিক্রি হয়ে পুঁজিটা আরও বেড়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ M-C-M′ (টাকা বা পুঁজি-পণ্য-অধিক টাকা বা পুঁজি), এই অর্থনৈতিক নিয়ম পুরোপুরি চালু হয়ে গেছে কৃষি অর্থনীতিতে। জমিতে পুঁজি বিনিয়োগ হচ্ছে। এ হ'ল পুঁজিবাদী অর্থনীতির নিয়ম — অত্যন্ত সহজ এবং স্পষ্টভাবেই তাই।

তাই এখানে টুকরো টুকরো জমিতে চাষ হচ্ছে কি না, মেসিন, ট্র্যাক্টর দিয়ে চাষ হচ্ছে কি না এসব অবান্তর কথা। ট্র্যাক্টর বা উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতির ব্যাপক ব্যবহার কেন এদেশে হচ্ছে না, সে বিষয়ে আলোচনা আমি এর আগে বহুবার করেছি। জাপানেও তো খণ্ড খণ্ড জমিতে চাষ হয়। 'বিগ ল্যান্ড ফার্মিং' (বৃহৎ খামার) নেই। তার দ্বারা কি প্রমাণ হয় জাপান পুঁজিবাদী দেশ নয়? এ দেশে বুর্জোয়ারা দেখছে যে, ট্র্যাক্টর, মেসিন ব্যাপকভাবে প্রবর্তন করলে এক ধাক্কায় লক্ষ লক্ষ লোক কৃষি থেকে উৎখাত হয়ে বেকার হয়ে যাবে। শহরে কলকারখানার অবাধ বিকাশ ঘটিয়ে এদের যদি কাজ না দেওয়া যায়, তাহলে পুঁজিবাদ এমনিতেই যে শহরের ক্রমবর্ধমান বেকারের চাপে ধুঁকছে সে তো আরও লক্ষ লক্ষ গ্রামীণ বেকারের চাপে মুখে থুবড়ে পড়বে।

দুনিয়াজোড়া অবাধ বাজারের সুবিধাকে সামনে রেখে ঊনবিংশ শতাব্দীতে পুঁজিবাদ যেভাবে তার শিল্প বিকাশের স্বার্থে গ্রামীণ জনসংখ্যাকে শিল্পে নিয়োগ করার তাগিদে, কৃষিতে ট্র্যাক্টর, মেসিনের প্রবর্তন করে কৃষি থেকে বাড়তি জনসংখ্যাকে মুক্ত করেছে, আজ বিশ্বজোড়া পুঁজিবাদী বাজারের আপেক্ষিক স্থায়িত্ব যেখানে লুপ্ত, সেই চূড়ান্ত বাজার সঙ্কটে জর্জরিত, বিপ্লবভীত ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদ, যে কিনা কলকারখানার মজুত উৎপাদিকা শক্তিকে পর্যন্ত পুরো কাজে লাগাতে অক্ষম হয়ে অলস করে রাখছে, অপচয় করছে সে কীভাবে কৃষির

আধুনিকীকরণ করতে পারে? কৃষির আমূল সংস্কারে হাত দিতে ভয় পেয়ে সে বরং উল্‌টো রাস্তা ধরেছে। বেশিরভাগ মানুষকে অর্ধভুক্ত, অর্ধনগ্ন করে ছোট-ছোট, টুক্‌রো টুক্‌রো জমিতে আটকে রাখছে এবং 'সবুজ বিপ্লবে'র ধোঁকাবাজিতে মানুষকে ভোলাচ্ছে। এ হ'ল সঙ্কটের মুখে পড়ে বুর্জোয়াদের শয়তানি পরিকল্পনা। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপারটা হ'ল — সি পি আই, সি পি আই (এম) যারা কৃষি বিপ্লবের কথা বলছে, সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদের কথা বলছে তাদেরও কৃষি সম্পর্কিত পরিকল্পনা মূলত একই। মেসিন-ট্র্যাক্টর প্রবর্তন, কৃষির আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে তাদের স্ববিরোধিতাটি লক্ষ্য করুন।

সি পি আই (এম) তার মজঃফরপুর দলিলে বলছে যে, ট্র্যাক্টর প্রবর্তন করলে তারা তার বিরোধিতা করবে, আন্দোলন গড়ে তুলবে। কেন? চাষী-মজুর নীতিগতভাবে ট্র্যাক্টর-মেসিন প্রবর্তনের বিরোধী নাকি? মেসিন-ট্র্যাক্টর তাদের শত্রু নাকি? হ্যাঁ, পুঁজিবাদী অর্থনীতি চালু থাকলে, মেসিন-ট্র্যাক্টর এলে বেকার সৃষ্টি করবে, অনেক মানুষের কাজ চলে যাবে — যেহেতু এখানে উৎপাদনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন। কিন্তু এই মেসিন-ট্র্যাক্টর সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় তো বেকার সৃষ্টি করে না বরং গ্রামীণ মানুষের জীবনযাত্রা তাতে উন্নত হয়, আধুনিক হয়।

তাই স্লোগান হওয়া উচিত — "গ্রামের উন্নতির জন্য মেসিন-ট্র্যাক্টর আসুক — আমরা চাই। কিন্তু যেহেতু পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় আমাদের বিকল্প কাজের সংস্থান করা হচ্ছে না, সেজন্য বিকল্প কাজ না দিয়ে ট্র্যাক্টর চালু করা চলবে না।" মজুর চাষীকে তাই বুঝতে হবে যে, পুঁজিবাদকে দ্রুত উৎখাত করার অবস্থা সৃষ্টি করতে না পারলে মেসিন-ট্র্যাক্টর চালু করার মধ্য দিয়ে দেশের মানুষের 'পারচেজিং পাওয়ার' (ক্রয় ক্ষমতা) না বাড়িয়ে, 'কন্ডিশন অব লিভিং'-কে (জীবনমান) না বাড়িয়ে, বিজলী বাতির আলো না এলে গ্রামের চেহারা পাল্‌টানো যাবে না। গ্রামগুলির বর্তমান পশ্চাৎপদ অবস্থা কাটানো যাবে না। উন্নতি ঘটবে না গ্রামীণ জীবনে। আর এইসব তথাকথিত কমিউনিস্টরা ট্র্যাক্টর-মেসিন প্রবর্তনের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে অর্থাৎ পুঁজিবাদকে টিকিয়ে রেখে মেসিন-ট্র্যাক্টর চালু করতে গেলে যে বিপুল বেকারবাহিনী সৃষ্টি হতে বাধ্য সেই বেকারিবিরোধী আন্দোলনকে পুঁজিবাদ বিরোধী আন্দোলনে 'ট্র্যান্সফর্ম' (রূপান্তরিত) করার পরিবর্তে বলছেন সামন্ততন্ত্র বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করতে। এর সঙ্গে সামন্ততন্ত্রের সম্পর্ক কী? সবই তো পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে জড়িত। বরং আমরা তো জানি যে, পুঁজিবাদী বিকাশের যুগে যখন পশ্চিমের দেশগুলোতে কৃষি অর্থনীতিতে কিছু কিছু মেসিন-ট্র্যাক্টর চালু হয়েছে তা সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতিকে উৎখাত করতেই সাহায্য করেছে। তাহলে মেসিন-ট্র্যাক্টর প্রবর্তনের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে সামন্তীবিরোধী আন্দোলনের সাথে যুক্ত করার প্রশ্ন আসে কোথা থেকে? অথচ কী অদ্ভুত যুক্তি এরা করে চলেছে!

কংগ্রেস দলের ভূমি সংস্কারের নীতি বা প্রোগ্রামের সঙ্গে তাই এইসব তথাকথিত কমিউনিস্ট ও বিরোধী দলগুলির কোনও তফাৎই নেই। সি পি আই, সি পি আই (এম) প্রভৃতি দলগুলির জমি বিলি করার মধ্য দিয়ে সামন্ততন্ত্র বিরোধী বিপ্লব ও শিল্প বিপ্লবের কার্যক্রমটি কংগ্রেসেরই অনুরূপ। 'সিলিং' এর ঊর্ধ্বে যে জমি আছে তা কংগ্রেসের ঘোষণা অনুযায়ী ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টন করার কথা — এমনকী সিলিং কমিয়ে পাঁচ একর পর্যন্ত করার কথা তো কংগ্রেসি মন্ত্রী এই সেদিনও বললেন। তাহলে তো বলতে হয়, উনি সবচেয়ে বড় বিপ্লবী; কারণ এর দ্বারা তো আরও বেশি জমি বিলি করা যাবে। এ সবই 'ইউটোপিয়া' (কল্পনা)। কেননা, সিলিং এর ঊর্ধ্বে যে জমি আছে তা সব নিয়েও যদি সারা দেশের ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টন করা যায় তবে একজন চাষী হিসাবমতো দু'তিন বিঘার বেশি জমি পেতে পারে না। এই জমি তার ও পরিবারের ভরণপোষণের অর্থে কিছুই নয় — 'আন-ইকনমিক হোল্ডিং' (অলাভজনক জোত)। তাছাড়া সে জমিও হাল-বলদ, খরচের টাকার অভাবে সে চাষও করতে পারবে না। ফলে এর আবার একটা ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া হবে উৎপাদনের উপর। খাদ্য সমস্যার সৃষ্টি হবে। অভাবের দরুন জমি শেষ পর্যন্ত হাতছাড়া হয়ে যাবে। তাহলে এইসব প্রোগ্রাম কার্যকরী কোন সমাধানই নয়। এগুলো 'স্টান্টে'র রাজনীতি হতে পারে।

জমি বিলি একটা মস্ত বড় সমস্যা। উদ্বৃত্ত জমি আন্দোলনের চাপে ভূমিহীনদের মধ্যে বিলি করা — গণতান্ত্রিক আন্দোলনের আজ একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ — এসবই জানা আছে। কিন্তু এর দ্বারাই বেকার সমস্যার সমাধান হবে, অবাধ শিল্প বিকাশের রাস্তা খুলবে, বাজার সম্প্রসারিত হবে এসব ধারণা তারাই পোষণ করে, তারাই জনতার মধ্যে এ ধরনের বিভ্রান্তি ছড়ায়, যারা জেনে হোক না জেনে হোক যে পুঁজিবাদ আজ জনজীবনের প্রতিটি সমস্যা ও সমস্ত প্রকারের দুর্গতির জন্য দায়ী তাকেই টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করছে।

এদের স্ববিরোধিতা কী অদ্ভুত দেখুন! এরাই আবার বলছেন যে, গ্রামে খেতমজুরের সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে, জমিতে পুঁজি বিনিয়োগ হচ্ছে, পুরনো অর্থনীতির সম্পর্ক ভেঙে যাচ্ছে। বলছেন — 'ক্যাপিটালিজম হ্যাজ মেড্ এ ডিসিসিভ্ ইন্‌রোড ইনটু এগ্রিকালচার' (কৃষিতে পুঁজিবাদ চূড়ান্তভাবে অনুপ্রবেশ করেছে)। তা, পুঁজিবাদের চূড়ান্ত অনুপ্রবেশ যদি কৃষিতে ঘটেই থাকে তাহলে সামন্ততন্ত্রটা গ্রামেই বা বিপ্লবের প্রধান শত্রু থাকে কী করে? তখন আবার নতুন করে ব্যাখ্যা হচ্ছে যে — না, না, সামন্তবাদ একটা পুরনো অর্থনৈতিক সম্পর্ক সেটি তো ভাঙছেই — কিন্তু ভাঙলে কী হবে — সামন্তপ্রভুরা এখন ধনী চাষীর সঙ্গে ভাগাভাগি করে শোষণ করছে।

তাদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী শ' শ' বিঘার মালিক হয়ে কেউ যদি গ্রামে থেকে চাষবাসে অংশগ্রহণ করে তাহলে সে জমিদার নয় — সে হবে ধনী চাষী, সে তখন জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের মিত্র। আর জমিদার কারা? যাদের যে পরিমাণ জমিই থাকুক না কেন, গ্রামে থেকে যদি তারা চাষবাসে অংশগ্রহণ না করে — তাহলে তারাই জমিদার! ধরুন, শহরের একজন লোক যার গ্রামে পনের বিঘা জমি আছে অথচ নিজে চাষবাস করে না, সে হোল জমিদার। আর এই লোকটার থেকে কয়েকগুণ বেশি জমির মালিক হয়েও গ্রামে থেকে চাষবাস করে বলে, আর একজন সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যাচ্ছে ধনীচাষী, ওঁদের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের মিত্রশক্তি। কারণ এরা না থাকলে গ্রামে তাদের চাষী সংগঠন হবে না। এরা যদি সঙ্গে না থাকে তাহলে ভোট হবে কোত্থেকে? গ্রামে ভোটের রাজনীতি 'কন্‌ট্রোল্' (নিয়ন্ত্রণ) করে সেই সমস্ত ধনী চাষীরা, যারা গ্রামে থেকে চাষবাস করে, শস্য গুদামজাত করে, ফাটকাবাজি করে। তা হলে, এই হচ্ছে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের হুঙ্কার যারা ছাড়ছেন তাদের রাজনীতির আসল চেহারা। এ কি বিপ্লবের তত্ব? নাকি এ হচ্ছে বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যেই কিছু সংস্কারের কার্যক্রম?

বিপ্লবের জন্য অত্যাবশ্যকীয় তিনটি শর্ত — সঠিক বিপ্লবী তত্ত্ব, সঠিক রাজনৈতিক লাইন ও সঠিক বিপ্লবী দল

তাই, লেনিনের সেই কথাটা আবার আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিই যে, বিপ্লবের তত্ত্ব ও রাস্তা ঠিক হওয়া দরকার, আর দরকার বিপ্লবের পার্টি ঠিক হওয়া। এই তিনটি শর্ত যদি আপনারা পূরণ করতে না পারেন তা হলে অনেক লড়াই আপনারা ইতিপূর্বে করেছেন, আবারও করবেন, কিন্তু শুধু লড়াই লড়াই খেলাই হবে। সেজন্য ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে করতেই এগুলি নিয়ে আপনাদের ভাবতে হবে। একত্রে লড়তে লড়তে ভাবুন। লড়তে গিয়ে অন্য ইউনিয়নের সঙ্গে মত পার্থক্য কোথায় এবং কেন, তা বোঝবার চেষ্টা করুন। আপনাদের সকলের ঐকান্তিক চেষ্টা হওয়া উচিত যাতে রাজনৈতিক মতবাদ আলাদা হওয়া সত্বেও একটাই ইউনিয়ন গড়ে তোলা যায়। এর জন্য চাই রাজনৈতিক মতাদর্শগত বিতর্কের ক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে সহনশীলতা। নিজেদের রাজনৈতিক মতবাদ অপরকে বুঝিয়ে, আদর্শের জোরে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে যদি কেউ নেতৃত্বে আসে তাহলে আপত্তির কী থাকতে পারে? কিন্তু অপরের মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে খর্ব করে, সমালোচনার অধিকারকে কেড়ে নিয়ে কেউ যদি শুধু কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে নেতৃত্ব করতে চায় তাহলে 'ফ্যাক্‌শনালিজম' বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠী গঠনের মনোভাব তো আসবেই। আর এই ফ্যাক্‌শনালিজম মানেই অযথা আমাদের সকলেরই সময় নষ্ট। একে অপরের বিরুদ্ধে চলতে গিয়ে, কাজ করতে গিয়ে যথার্থভাবে শ্রমিকদের মধ্যে বিপ্লবী চেতনা ও সংগঠন গড়ে তোলার দিকে আত্মনিয়োগ করতে পারি না। সেজন্য শ্রমিকদের একটা মাত্র ইউনিয়ন গড়ে তোলার পক্ষে বাধা হ'ল — 'ইমপেসেন্স' (অধৈর্য) বা 'ল্যাক অব ফিলোসফিক্যাল টলারেন্স' (আদর্শগত অসহিষ্ণুতা)। অপরের মত শুনব না, আলোচনা করতে দেব না, 'গ্যাগ্' করব (চেপে দেব), তাহলে তো 'স্‌প্লিট' (ভাঙন) হবেই। কারণ মত কখনও পদানত থাকতে পারে না। আপনি যেমন আপনার মতে বিশ্বাস করেন, অপরে ভুল হলেও তার নিজের একটা মত আছে, সে তাতে বিশ্বাস করে। এই দু'টি মতের খোলাখুলি সংঘর্ষের সুযোগ থাকা দরকার। আপনি আমার উপর আপনার মত চাপাতে চাইলে, আমি তা মানতে পারি না। তাই খোলাখুলি মত বিনিময় হলে, প্রকাশ্য আলোচনা-সমালোচনা হলে, জনসাধারণের সুযোগ থাকে — কে ঠিক আর কে বেঠিক বোঝবার। আপনি যদি ঠিক থাকেন, আলোচনায় আপনার তো কোন ভয়ের কারণ নেই। বরং আলোচনায় আপনার জয় তো সুনিশ্চিত। যে ভুল জায়গায় আছে, মিথ্যা আঁকড়ে আছে, যার দুর্বলতা আছে সে-ই আলাপ-আলোচনা, মতাদর্শগত সংঘর্ষে

ভয় পায়। শৃঙ্খলার দোহাই দিয়ে, ঐক্যের নামে নানা অজুহাতে সেই কেবল কর্মী ও সমর্থকদের এই খোলাখুলি আলোচনার বাইরে রাখে। জনসাধারণকেও বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। আপনারা সেই পথ পরিত্যাগ করুন। মতের বিনিময় ঘটান। এই পথেই শ্রমিকশ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে সামিল করার চেষ্টা করুন।

সংগ্রাম আপনাদের করতেই হবে। এমন কথা নয় যে আপনারা লড়বেন না। পেট বড় বালাই। আজ যদি ভাবেনও যে লড়াই করে কিছু হবে না — দু'দিন বাদেই আবার লড়াইয়ের ময়দানে নামতে আপনাদের হবেই। ইতিমধ্যেই তার আভাস দেখা যাচ্ছে। হাজার হাজার লোক মাঠে-ময়দানে আসবেন, লড়াই শুরু করবেন কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন হবে না। অবস্থা পরিবর্তন করতে গেলে দরকার সেই তিনটি জিনিস — সঠিক মূল রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, সঠিক বিপ্লবী তত্ত্ব এবং সঠিক বিপ্লবী পার্টি। এ যদি না থাকে, রাস্তা যদি ভুল হয়, তাহলে সততা, কোরবানি, সংগ্রাম কোন কিছুর দ্বারাই আপনারা সামনে দিকে এগোতে পারবেন না। তাই আবার সেই লেনিনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলি — যত গণতান্ত্রিক আন্দোলনই করুন, যত দাবিদাওয়া নিয়ে লড়ুন, শহীদ দিবস করুন, বুকের রক্ত ঢেলে দিন, ধর্মঘট ও আন্দোলনে পুলিশের সাথে যতই মোকাবিলা করুন — আপনারা যে গোলাম সেই গোলামই থাকবেন। যে পুঁজিবাদ সেই পুঁজিবাদই থাকবে, শোষণ অব্যাহত থাকবে। দশ টাকা, তিরিশ টাকা মাইনে হয়তো বাড়বে। কিন্তু বাজারে জিনিসপত্রের দাম এমনিই বেশি, এর উপর বাড়বে অনেকগুণ বেশি। আবার মাইনে বাড়ানোর জন্য লড়বেন, রক্ত ঢালবেন, পাঁচ টাকা বাড়াবেন, ফের জিনিসপত্রের দাম বাড়বে। শুধু তাই নয় — এই অনিশ্চয়তা, উদ্দেশ্যহীনতা নৈতিক জীবনেও অবক্ষয় ডেকে আনবে। যে সুখের স্বপ্ন দিয়ে পরিবার গড়ে তুলেছেন, পরিবারের মধ্যে, আপনার একান্ত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মধ্যেও বর্তমান সমাজের যে 'সোস্যাল ম্যালাডি' (সামাজিক ব্যাধি) রয়েছে তার ছাপ পড়বে, সেগুলো ঢুকে যাবে। আপনি সুখের পরিকল্পনা করে, অনেক স্বপ্ন নিয়ে ঘর গড়েছিলেন। ঘরে গিয়ে দেখবেন সে সংসারও থাকছে না। যে স্ত্রীকে নিয়ে ঘর করতে যাচ্ছেন সেখানেও দেখবেন শান্তি নেই, ভালবাসা নেই। যে সন্তান-সন্ততির জন্য নিজে কষ্ট স্বীকার কম করছেন না, এমনকী কোন কিছুরই পরোয়া করেননি, সেগুলিই দেখবেন — এক একটা এক এক মূর্তি — কোনটা চিত্রাভিনেতার চেলা, কোনটি কোথাকার কোন্ খেলোয়াড়ের চেলা হয়ে বসে আছে। অর্থাৎ এক কথায় আপনি আপনার 'কিথ্ অ্যান্ড কিন্'-দের (আত্মীয় পরিজনদের) নিয়ে একদম বিচ্ছিন্নভাবে — সাতে নেই, পাঁচে নেই, ঝুট্ঝামেলায়, রাজনীতিতে কোন কিছুতেই নেই, শুধু চাকরি-বাকরি আর খাওয়া-দাওয়া ঘুমের মধ্যে থেকেও নিজেকে এর হাত থেকে বাঁচাতে পারবেন না। সামাজিক সমস্যার ভূত আপনার ঘরে গিয়ে ঢুকবে। আপনার ব্যক্তিগত জীবন বিষাক্ত করে দেবে। ভালবাসা নষ্ট করে দেবে। আপনার স্নেহ-মমতা পর্যন্ত ধ্বংস করে দেবে। বাঁচতে হলে লড়াই আপনাদের করতেই হবে। আর এই লড়াইটা করতে হবে বিপ্লবের রাস্তায়। বিপ্লবের রাস্তা মানে 'বিপ্লব' 'বিপ্লব' বলে শুধু চিৎকার নয়। বিপ্লবের সঠিক স্তর, রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্র সম্পর্কে সঠিক সুস্পষ্ট ধারণাকে ভিত্তি করে, সঠিক বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্বে মজুরদের যদি সংগঠিত করতে পারেন, উপযুক্ত রাজনৈতিক শিক্ষায় যদি শিক্ষিত করে তুলতে পারেন তবেই আপনারা জনগণের রাজনৈতিক শক্তির জন্ম দিতে পারবেন, রাজনৈতিক ক্ষমতার সৃষ্টি করতে সক্ষম হবেন এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হবেন। তখনই আসবে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ, ভারতবর্ষের কোটি কোটি নিপীড়িত মানুষগুলো দেখবে বিপ্লবের মুখ। তার আগে পর্যন্ত শুধু বিক্ষোভ আর পরাজয়। শুধু বিস্ফোরণ আর পরাজয়। এর হাত থেকে মুক্তি, সমাজের মুক্তি, মানুষের মুক্তির রাস্তা একটাই — তা হ'ল বিপ্লবের রাস্তা। এছাড়া ভিন্ন কোন পথ নেই।

ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ

১। কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী — সভার প্রধান অতিথি

২। নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার পরিচালিত দল

১৭ মার্চ ১৯৭৪ প্রদত্ত ভাষণ।
১৯৭৬ সালের নভেম্বর মাসে
ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী কর্তৃক
প্রথম পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়।